Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 485–494
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রবীন্দ্র তত্ত্বনাটকে বাউলগানের আধার

সালেহা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : saleha19794@gmail.com

Keyword
বাউল গান, রবীন্দ্রনাথ, তত্ত্বমূলক গান, লোকসংগীত, সাধুসন্ত, সহজিয়া, বৈষ্ণব, ফকির, দরবেশ

Abstract
বাউল গান হল একটি তত্ত্বমূলক গান। এই গানের মূল উদ্দেশ্য হল 'মনের মানুষ' খোঁজা। বাউল সাধুসন্তরা এই গানের মাধ্যমে তাঁদের অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করে থাকেন। বাংলায় যতগুলি লোকসংগীত রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এই বাউলগান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একসময় শিক্ষিত জনসমাজের কাছে এর কোনো মূল্যই ছিল না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গানের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং তিনিই প্রথম শিক্ষিত সমাজের কাছে এই গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। তারপর থেকে স্খলিত বাউলগান ধীরে ধীরে তার যথাযত সম্মান ফিরে পেতে থাকে। তবে বাউলগান ও ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ যে কবে থেকে জন্মেছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু না বলা গেলেও বাউলগানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে শিলাইদহে জমিদারী তদারকি করতে গিয়ে প্রবল ভাবে জন্মেছিল সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। শিলাইদহে এসে তিনি বৃহৎ গ্রামীণ লোকজীবনের সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে। আসলে ভাবের গভীরতায়, ভাষার সরলতায়, সুরের দরদে বাউলগান অনন্য। তাই এই গান পুরানো হয়েও চিরআধুনিক। 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় বাউলগানের সুর ও বাণী কবির মনের মধ্যে প্রগাঢ় ভাবে মিশে গিয়েছিল। তিনি জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে তাঁর বহু গানে তিনি বাউলসুর বসিয়েছেন। তবে শিলাইদহে বাউলগানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে পরিচিত হলেও সম্ভবত সেখানে তিনি বাউলগান রচনা করেন নি। শিলাইদহ থেকে ফেরার পর তিনি একের পর এক বাউলাঙ্গ সুরে গান রচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে এই বাউলগানের প্রয়োগ থাকলেও নাটকে মধ্যে আমরা সর্বাধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করি। বিশেষ করে তাঁর তত্ত্বনাটকের গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রতিটি বাউলগান যে নাটকের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গেও গানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

Discussion

রবীন্দ্র নাট্যসংগীতে যতগুলি দেশজ সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাউলগান। বাউলগান হলো একটি তত্ত্বমূলক গান। মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাব এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বাউল সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হলো 'মনের মানুষ' খোঁজা। বাউল সাধুসন্তরা মরমীয়া কবি। এঁরা সহজিয়া পথের সাধক। জাত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে ভালোবাসাই হলো বাউলের মূল দর্শন। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনের সামগ্রিক রূপ গানের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো বাউল সাধকদের প্রধান কাজ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, শৈব শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম মতালম্বীরা থাকলেও মূল তত্ত্বে কিন্তু তাঁরা সকলে এক এবং অভিন্ন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন তৈরি করতে এই গানের অবদানও অসামান্য। কিন্তু তৎকালীন ভদ্র সমাজের কাছে এর কোনো কদর ছিল না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভদ্র তথা শিক্ষিত সমাজের কাছে এই গানের তত্ত্বমূল্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন–

> "বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত সমাজে তাহার কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রস পিপাসু কবিচিত্ত অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়া অবহেলিত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের রস সম্পদ বহুগুণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দিয়াই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বাউল গানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউল গানের সংগ্রহেও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন নাগরিক মানুষ। সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তা সত্বেও তিনি শৈশব থেকে জমিদারী বৈভব ও বিলাসিতা বিমুখ ছিলেন। ছোট থেকেই তিনি লোকায়ত জীবনানুযায়ী সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যে সমস্ত লোকসংস্কৃতির চর্চা করা হতো তা কবিকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতো এবং তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে তা উপভোগ করতেন।

১৮৯০ সালে জমিদারী দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পাতিসর, পাবনা, কুষ্টিয়াসহ রাজশাহী জেলার বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। ফলে সেখানকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাউল, বৈষ্ণব, ফকির, দরবেশ, চাষা, মাঝি ইত্যাদি সকল গোত্রের মানুষের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি তাঁর যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারা হলেন বাউল সম্প্রদায়। বাউল গায়কদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হওয়ায় কবির অজান্তে তাঁর মনের উপর বাউলগানের প্রভাব পড়েছিল। যার স্বরূপ আমরা তাঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করি। যদিও তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন –

> "আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য অনেক রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে।"[২]

এর থেকে বোঝা যায় বাউলগানের সুর ও বাণী রবীন্দ্রচিত্তকে কতটা প্রভাবিত করেছিল। এবং উপরের মন্তব্যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর বহু গান বাউলসুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবের গভীরতায়, ভাষার সরলতায়, সুরের দরদে বাউলগান অনন্য। এর সঙ্গে অন্য কোনো সংগীতের তুলনা হয় না। কিন্তু এটি অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান রচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কখনো তিনি বাউলগানের হুবহু নকল করেন নি। বরং তিনি বাউলগানকে সৃজনশীলতার দ্বারা সময়োপযোগী করে রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাউল প্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর বহু গানে তিনি বাউলগানের সুর বসিয়েছেন। আসলে কবি ছিলেন আদ্যপ্রান্ত বাউল। বাউল গান সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

> "আমাদের সংগীত ও রাজসভা, সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মতো আদরে বাড়িতে ছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সংগীত বাউলের গান এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড়ো শিল্পও টিকিতে পারে না।"[৩]

অর্থাৎ বাউলগান কখনো পতিত হয় না, তা পুরাতন হয়েও চিরআধুনিক। এটাই এর মূল বিশেষত্ব। এই লোকঐতিহ্যবাহী গান রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমি এখানে কেবল তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকে ব্যবহৃত বাউলগান নিয়ে আলোচনা করবো। কেননা, বাউলগান ও বাউল গায়কীর সবচেয়ে বেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর তত্ত্বনাটক বা রূপক-সাংকেতিক নাটকে।

'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকটি ঋতু উৎসবের নাটক। শরৎ উৎসবকে কেন্দ্র করেই 'শারদোৎসব' নাটক। নাটকের সবগুলি গান শরৎ উৎসবের মন্ত্র হয়েই ঝরে পড়েছে। এটি ঋতু উৎসবের নাটক বলে এখানে রবীন্দ্রনাথ অপরিমিতভাবে সংগীতের ব্যবহার করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন–

> "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না ...তার ভিতরকার নিত্যনতুন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহ বেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।"[৪]

'শারদোৎসবে' শরতের অপরূপ সৌন্দর্য ও কবির অন্তর্নিহিত মননের কথা নিপুণভাবে গানগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। শঙ্খ ঘোষ এই নাটকটির গড়নের সঙ্গে বাংলার আধুনিক ব্রতকথার মিল খুঁজে পেয়েছেন।[৫] ব্রত অনুষ্ঠানে যেমন সকলে সমবেতভাবে উৎসব করে এই নাটকেও তেমনি সম্মিলিতভাবে উৎসব করতে দেখা যায়। তবে এ নাটকের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক আচারধর্ম নেই ঠিকই কিন্তু এর গড়নের মধ্যে ব্রতগানের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় বলে মনে করেন কবি সমালচকগণ।[৬] 'শারদোৎসব'-এর গানগুলির মধ্যে ঋতু ও প্রকৃতির মিলন ঘটলেও বেশিরভাগ গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর মিশে রয়েছে। যদিও নাটকটির শুরুতে প্রথম দৃশ্যে পথে বালকদের গাওয়া –

> "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
> বাদল গেছে টুটি।"

গানটিতে বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। শরৎ মূলত উৎসবের ঋতু। এই সময় প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষের মনেও উৎসবের স্ফূর্তি জেগে ওঠে। বালকদের এই গানের মধ্যে সেই পরিপূর্ণ ছুটির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে।
নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বেতসিনীর ধারে ঠাকুরদা বিশুদ্ধ বাউল সুরে গেয়ে ওঠেন এই গান -

> (গান)
> "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
> লুকোচুরি খেলা।
> নীল আকাশে কে ভাসালে
> সাদা মেঘের ভেলা!" (২য় দৃশ্য)

এই গানটিতে শরতের সৌন্দর্য লালিত্যে অপরূপ ফুটে উঠেছে। গানের মধ্যে একদিকে যেমন শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে আকাশ ভরা আলোয় মুখর প্রকৃতির ছবিও ফুটে উঠেছে। বাউল সুরে গাওয়া এই গানটি শান্তিদেব ঘোষের মতে সারিগানের সুরে রচিত। তিনি বলেছেন –

> "'আজ ধানের ক্ষেতে' গানটির সাহায্যেই সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে গুরুদেব প্রথম সারিগানকে ঋতুসংগীতে পরিণত করলেন।"[৭]

আবার নাটকের শেষে ঠাকুরদাদা ও সকলে সমবেত সুরে গেয়েছেন -

> (গান)

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!"

এই গানটিও বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া। ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যে অরূপের যে প্রকাশ ঠাকুরদাদা তা উপলব্ধি করায় সেই অরূপ ভাব এই গানের মধ্যে স্পষ্ট উঠেছে। মনে রাখতে হবে এ নাটকে সর্বপ্রথম ঠাকুরদাদা চরিত্রের দেখা মেলে। তবে চরিত্রটি এখানে পরিপূর্ণতা পায়নি।

'রাজা' (১৯১০) নাটকটি বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত 'কুশ জাতকের' কাহিনি অবলম্বনে রচিত। রূপের সাধনা ও অরূপের আরাধনা হলো এই নাটকের মূল ভাববস্তু। 'রাজা'তে মোট গানের সংখ্যা ছাব্বিশ। এর মধ্যে বেশিরভাগ গান ঠাকুরদা ও সুরঙ্গমা গেয়েছেন। এখানে ঠাকুরদা চরিত্রটি 'শারদোৎসবে'-র ঠাকুরদাদা ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর সমগোত্রীয় বলা যায়। এছাড়া পাগল ও মূল বাউল গায়কী চরিত্রের উল্লেখও রয়েছে। তবে নাটকের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। নাটকটি গড়ে উঠেছে কায়িকহীন রাজাকে কেন্দ্র করে। এখানে রাজা অদৃশ্য। তাই তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে যখন রাজ্যের মানুষের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে তখন বাউলের দল গেয়ে ওঠেন–

(গান)
"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।" (২য় দৃশ্য)

গানটি বাউলের দল গেয়েছেন তাই এটি যে খাঁটি বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। বাউলের মধ্যে যে প্রাণের মানুষের অবস্থান তা সর্বত্রচারী। বাউলদের মতে প্রাণের মানুষের অবস্থান দেহে। কিন্তু মানুষ ভ্রমের বশে মূর্খের ন্যায় বাইরে তার অনুসন্ধান করে।[৮] বাউল যে প্রাণের মানুষের কথা বলেন এই নাটকে রাজা সেই একই প্রাণের মানুষ। তাই তাঁকে ভাবের দ্বারা অনুভব করতে হয়। ঠাকুরদা ও সুরঙ্গমা ভাবের দ্বারা রাজাকে প্রাণের মধ্যে অনুভব করেছেন। তাই বাউল দলের গাওয়া এই গানটি নাট্য অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্যে বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ওই একই দৃশ্যে পাগলের গাওয়া গান–

(গান)
"তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।" (২য় দৃশ্য)

গানটিতে বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। বাউল তাদের গানের মাধ্যমে যে 'প্রাণের মানুষ'কে খুঁজতে চায়, পাগলও তার গানে 'সোনার হরিণ' চাওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই মনের মানুষকে পেতে চেয়েছে। আবার তৃতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদা সকলকে সত্য উপলব্ধি করাতে বাউলাঙ্গ সুরে গেয়ে ওঠেন–

(গান)
"মোদের কিছু নাই রে নাই
আমরা ঘরে বাইরে গাই।"

এই একই দৃশ্যে বসন্তকে আহ্বান জানিয়ে ঠাকুরদা গায়–

(গান)
"বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।"

এই গানটিতেও বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে। আবার এটিকে ঋতুসংগীতও বলা যেতে পারে। বসন্তে যেমন ফুলের মেলা হয়, তেমনি আবার শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলাও হয়। প্রভুর পায়ের নীচে কেবল হীরা মতি, মুক্ত মাণিক্যের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে না, তাঁর চরণে লক্ষ মাটির ঢেলাও লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। ঠাকুরদার এই গানের মধ্যে রাণী সুদর্শনার জীবনে আসন্ন বিপদের সংকেত ধ্বনি ব্যঞ্জিত হয়েছে। আবার নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে বাউলাঙ্গ সুরে বাউল দল গেয়েছেন–

(গান)
"যা ছিল কালো ধলো

তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।"

রাজা বাহ্যিক রঙে নয়, সকলকে যে ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে তুলতে চান বাউলের দল সেই ভাব এই গানটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে। 'রাজা' নাটকের প্রতিটি গান নাট্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চরিত্রের মতো গানগুলিও নাটকে বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি গান নাট্য সংলাপের ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

'অচলায়তন' (১৯১২) হল প্রথাগত নিয়ম নীতি বিরোধীমূলক নাটক। এই নাটকের গানের মধ্যে দিয়ে নাটকের সমগ্র ভাববস্তু চিত্রায়িত হয়েছে। নাটকে মোট তেইশটি গান রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চক ও শোণপাংশুদের গাওয়া ছয়টি গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই রয়েছে পঞ্চকের এই গান–

(গান)
"এই পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে-
তা কে জানে তা কে জানে।"

পঞ্চকের এই গানে বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। এই গানের মধ্যে পঞ্চকের তীব্র মুক্তির পিপাসা জাগ্রত হয়েছে। ওই একই দৃশ্যে শোণপাংশুর দল গেয়েছে–

(গান)
"আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে!"
অথবা,
(গান)
"কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!"

এই গান দুটিতে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব আছে। সেই সঙ্গে গান দুটিকে আমরা কর্মসংগীতও বলতে পারি। শোণপাংশুদের জীবনে শাস্ত্রের কোনো নিয়ম নীতির বন্ধন নেই। তাদের জীবন কর্মময় হলেও তারা গান ও নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে। এই দুটি গানের মধ্যে তাদের কর্মময় জীবনের আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে শোণপাংশুরা আবার বাউলাঙ্গ সুরে গেয়েছেন–

(গান)
"সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।"

আসলে শোণপাংশুদের জীবন মুক্ত। তারা কোনো নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। যে কোনো কাজ তারা অনায়াসে করতে পারে। তাদের এই মুক্ত আনন্দময় ও বর্ণময় জীবন পঞ্চককে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। পঞ্চক তাদের এই গানের মধ্যে মুক্ত জীবনের আস্বাদ খুঁজে পায়। আবার, শোণপাংশুরা দাদাঠাকুরকে কেন্দ্র করে গেয়েছেন–

(গান)
"এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।"

গানটি বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া। শোণপাংশুদের জীবন যে বন্ধনহীন, মুক্ত, আনন্দময় তার একমাত্র মূলে রয়েছেন তাদের দাদাঠাকুর। পঞ্চম দৃশ্যে বাউলাঙ্গ সুরে শোণপাংশুরা দাদাঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে আবারও গেয়েছেন–

(গান)
"যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।"

তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের যে প্রাচীর অচলায়তনের বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ভিতরের জগতের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাদাঠাকুর শোণপাংশুদের নিয়ে সেই প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। দাদাঠাকুরের যে মন্ত্রবলে তারা এই অসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করতে সাহস পেয়েছিল। সেই মন্ত্র এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

'ফাল্গুনী' (১৯১৬) হলো যৌবন ও বসন্তের নাটক। নাটকের ভাব প্রতিটি দৃশ্যের গানের মধ্যে মিশে রয়েছে। অন্যান্য নাটকে মূলত নাট্যচরিত্ররা গান গায় কিন্তু এ নাটকে প্রকৃতি নিজেই গান গেয়েছে। 'ফাল্গুনী'-র সঙ্গে অন্যান্য নাটকের এখানেই পার্থক্য। এই নাটকে মোট গানের সংখ্যা ত্রিশ। তার মধ্যে বারোটি গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে। নাটকের সূচনা অংশের গীতি-ভূমিকায় 'নবীনের আবির্ভাবে' বেণুবনের গান–

(গান)
"ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"

শীতের অবসানে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি জুড়ে যে আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় তারই প্রকাশ ঘটেছে এই গানের মধ্যে। গানটিতে বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। আবার দাদা যখন কর্মের চাপে জীবন যৌবনের আনন্দ ভুলে যায়, তখন নব যৌবনের প্রতীক যুবকদল খেলা নিয়ে আনন্দে মেতে থাকে। তারা গেয়ে ওঠে –

(গান)
"মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।"

বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া এই গানের মধ্যে প্রাণের আনন্দ লুকিয়ে আছে। তারা খেলাকে সঙ্গী করে লড়তে চায়, তাদের বাঁচা মরা সবই এই খেলা। কারণ, খেলার মধ্যে রয়েছে জীবনের চরম আনন্দ। আসলে রবীন্দ্রনাথ খেলার সঙ্গে কাজকে মিলিয়ে দিয়ে এক নবতর লীলাভূমি তৈরি করেছেন।

যৌবন কখনো বুড়ো হয় না। যে কোনো বয়স যৌবনকে ছুঁতে পারে। আর সেখানেই যৌবনের জয়। দাদা এখানে প্রবীণ তাঁর মতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌবনও হারিয়ে যায়। কিন্তু নবযৌবনের দল এই মতে বিশ্বাসী নয়। তাই তারা দাদাকে ঘিরে বাউল সুরে গায়–

(গান)
"আমাদের পাকবে না চুল গো-মোদের
পাকবে না চুল।"

অর্থাৎ যা অন্তিম, যার কোনো কূল নেই, যা অধরা তাই যৌবন।

ওই একই দৃশ্যে 'বুড়ো ধরা' খেলায় বুড়োকে ধরতে নবযৌবনের দল মনে কোনরকম ভয়ের চিহ্ন না রেখে যৌবনের প্রাণশক্তিতে ভর করে গেয়ে ওঠে–

(গান)
"আমাদের ভয় কাহারে
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।"

এই গানটিও বাউল সুরে গাওয়া হয়েছে। সত্যিই তাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কেননা, তাদের হারানোর মতো কোনো সম্পদ নেই। তারা পার্থিব জগতের আরাম আয়েশ, সুখ-শান্তি, প্রশংসা কোনো কিছুরই দাবী করে না। তারা কেবল বাঁচা মরার খেলায় সমান ভাবে আনন্দ উপভোগ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের 'সন্ধান' নাট্যাংশে যৌবনের দল ঘাটের মাঝির কাছে বুড়োকে খুঁজতে আসে। তারা আদ্যিকালের বুড়ো'-কে নিয়ে বসন্ত উৎসব করবে শুনে মাঝি তাদের পাগল ভাবলে তারা গেয়ে ওঠে–

(গান)
"আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় নুকিয়ে থাকে রে।"

গানটি বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া হয়েছে। এই গানের মধ্যে দিয়ে ফাগুন হাওয়া নবযৌবনের দলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সেই ক্ষেপামির তালে তালে এগিয়ে চলা তাদের কামনা। তাদের এই চলার মধ্যে তারা নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে পায়। আবার মাঝির মতো কোটালও এদেরকে পাগল মনে করে। 'বুড়ো'কে খোঁজা তার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়। কিন্তু নবযৌবনের দল পথ চলতে চলতে রাস্তা খুঁজে নেয়। তাদের এই অনির্দিষ্ট পথ চলা কোটাল বুঝতে পারে না। তাই সে চলার মানে জিজ্ঞাসা করলে তারা গায়–

(গান)
"চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।"

এই গানেও বাউল সুরের প্রভাব আছে। এছাড়া আরও যে সমস্ত গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে সেগুলি হলো – 'ভালো মানুষ নই রে মোরা' অনাথ কলুর পোষ্য ছেলেকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে যুবকদল খুশিতে এই গানটি গেয়ে ওঠে। আবার তৃতীয় দৃশ্যের গীতি ভূমিকা -'প্রবীণের পরাভব' অংশে 'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি।' গানটি বসন্তের হাসির গান। এটিও বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া। তৃতীয় দৃশ্যের 'সন্দেহ' অংশে বাউলের গাওয়া– 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে/ চলো তোমার বিজন মন্দিরে।' গানটিতে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে এবং চতুর্থ দৃশ্যের 'প্রকাশ' নাট্যাংশের ছয়টি গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে। যেমন, যুবকদলের গাওয়া- 'তুই ফেলে এসেছিস কারে।' ও 'আমি যাব না গো অমনি চলে।' আর অন্ধবাউলের গাওয়া- 'সবাই যারে সব দিতেছে/ তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।' ও 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার/ জয়ের মালা।', 'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে' এবং 'তোমায় নতুন করে পাব বলে/ হারাই ক্ষণে ক্ষণে' এই ছয়টি গানেও বাউলাঙ্গ সুর বসানো হয়েছে।

'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক জাতীয়তা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের বিবাদ ও শত্রুতা এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ নাটকের ভাষাতীতকে প্রকাশ করতে গানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই নাটকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'মুক্তধারা'তে মোট গানের সংখ্যা চোদ্দ। এর মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে ছ'টি গান, আর বাকি আটটি গান 'মুক্তধারা' নাটকের জন্য রচিত হয়েছে। তবে চোদ্দটি গানের মধ্যে আটটি গানে বাউলাঙ্গ সুরের প্রভাব রয়েছে। আর এই আটটি গানই ধনঞ্জয় বৈরাগীর গাওয়া। নাটকের প্রথম দুটি গান বাদ দিয়ে তৃতীয় গানটি ধনঞ্জয় বৈরাগী গেয়েছেন–

(গান)
"ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।"

বাউলাঙ্গ সুরে গাওয়া এই গানটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই একই গান এ নাটকেও ব্যবহার করেছেন। এই গানটির মধ্যে দিয়ে ধনঞ্জয় অভিজিৎ-এর না ফেরার বার্তা দিয়েছেন। এই গানটি গভীর ভাব প্রকাশের পাশাপাশি নাটকে Suspense তৈরি করেছে। নাটকের পঞ্চম গানটিও ধনঞ্জয়ের গাওয়া–

(গান)
"আরো আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করেই মারো, মারো।"

এটিও 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে নেওয়া হয়েছে। বাউল সুরে গাওয়া এই গানটি ধনঞ্জয় নাটকে তিনটি পর্যায়ে গেয়েছেন। এই গানটির মাধ্যমে তিনি জীবনদেবতা অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এই গানটি মূলত রাষ্ট্রের নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে আত্মশক্তি জাগানোর গান। নাটকের ষষ্ঠ গানটিও ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে গাওয়া–

(গান)

''ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।''

এই গানটি তিনটি পর্বে বিভাজিত করে গাওয়া হয়েছে। বাউল সুর মিশ্রিত এই গানটি রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা'-র জন্যই লিখেছিলেন। এই গানের মধ্যে দিয়ে ধনঞ্জয় হেয়ালি ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন। ধনঞ্জয়ের মতে রাজ্য কারোর একার হতে পারে না। রাজ্য যেমন রাজার তেমনি প্রজারও। কিন্তু রাজার অহংবোধ যখন স্ফিত হয়ে দেবতার ওপর চোখরাঙায় তখন প্রজারা বিস্মিত হলেও দেবতা দুঃখ পান। নাটকে ধনঞ্জয়ের এই গভীর উপলব্দধি মূলক গানটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

নাটকের সপ্তম গানটিও ধনঞ্জয়ের একক কণ্ঠে বাউল সুরে গাওয়া–

(গান)

''আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন''

এই গানটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে গানটি রবীন্দ্রনাথ হুবহু তুলে আনেননি, কিছু শব্দের অদল বদল করেছেন মাত্র। শিবতরাইয়ের প্রজাদের প্রত্যুত্তরে গাওয়া ধনঞ্জয়ের এই গানের মাধ্যমে কেবল আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। একইভাবে অষ্টম গানটিও ধনঞ্জয় বাউলাঙ্গ সুরে গেয়েছেন। গানটি হল–

(গান)

''আমাকে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে''

এই গানটিও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে সরাসরি নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে সেখানে উক্তিগীত ছিল, কিন্তু এখানে তা নেই। ধনঞ্জয় বৈরাগী শিবতরাইয়ের প্রজাদের মুখপাত্র হয়ে গানটি গেয়েছেন। বাউলের মতো নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে রাজার সকল শাসন অমান্য করে নির্ভয়ে গান গেয়েছেন। নাটকের নবম গানটিও তাঁরই কণ্ঠে শোনা যায়। ধনঞ্জয় চারটি পর্বে সংলাপের মাঝে মাঝে গানটি গেয়েছেন। গানটিতে বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। গানটি হল –

(গান)

'রইল বলে রাখলে কারে'

রাজা খাজনা আদায়ের জন্য জোরপূর্বক ধনঞ্জয়কে ধরে রাখলে তিনি কৌতুকের সুরে রাজাকে বিদ্ধ করার জন্য গানটি গেয়েছেন। এই গানের মধ্যে আছে কেবল পরিহাস।

একইভাবে দশম গান ধনঞ্জয়ের গাওয়া 'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।' গানটিতেও বাউল সুরের প্রভাব রয়েছে। আবার একাদশ গানটিও ধনঞ্জয় বাউলাঙ্গ সুরে গেয়েছেন। গানটি হল– 'আগুন আমার ভাই,/ আমি তোমারি জয় গাই।' এই গানটিও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে সরাসরি তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। ধনঞ্জয় বুঝতে পারে পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। তাই গানের মধ্যে একদিকে যেমন বন্দিদশাকে মেনে নিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে আবার আগুনকে 'ভাই' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। গানটির মূল তাৎপর্য হলো যা অশুভ তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে ধনঞ্জয় আগুনকে 'ভাই' সম্বোধন করে কাছে টেনে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে যান্ত্রিক সভ্যতা ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন তার অনবদ্য প্রকাশ **'রক্তকরবী'** (১৯২৬) নাটক। এই নাটকে তিনি ধনতান্ত্রিক জীবনকে ত্যাগ করে কৃষি জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। নাটকে ব্যবহৃত-

''পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে–আয় রে চলে,
আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে যে আজ পাকা ফসল্
মরি, হায় হায় হায়।''

এই গানটি বাউল সুরে রচিত। সমবেত সুরে গাওয়া এই গানটি নাটকের মূলসুরও বলা যায়। বাউলাঙ্গ সুরে রচিত এই গানের সঙ্গে লোকসমাজের মানুষের জীবন সম্পৃক্ত আছে। আকর্ষণজীবী সভ্যতা সাধারণ মানুষকে কৃষি কাজ থেকে যেভাবে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে সেখান থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এই গানের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গানটি মূলত ফসল কাটার গান। তাই এটিকে আমরা কর্মসংগীতের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নামের গল্পের নাট্যরূপ হলো **'তাসের দেশ'** (১৯৩৩) নাটক। গঠনগত দিক থেকে রূপকথার আদলে রচিত হলেও রূপক-সংকেতের মাধ্যমে নাটকের ভিতরে যে তাত্ত্বিক ভাব রয়েছে তা আমাদের কুসংস্কার আশ্রিত মনকে নাড়া দিয়েছে। রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে এটি যতটা সাফল্যমণ্ডিত, নাচ গান থাকায় নৃত্যনাট্যের দিক থেকে ঠিক ততটাই মঞ্চসফল নাটক। 'অচলায়তন' নাটকে যে অর্থহীন সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে, 'ফাল্গুনী'তে যৌবনের ছোঁয়ায় জড়তার বন্ধনমুক্তির যে কথা আছে, 'রক্তকরবী'তে যান্ত্রিকতা থেকে প্রাণময়তায় উত্তীর্ণ হওয়ার যে কথা আছে, সেই একই কথার ধ্বনি আমরা 'তাসের দেশ' নাটকের মধ্যে শুনতে পাই। আমরা জানি নাটকের ভাববস্তু তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে গানের অপরিসীম ভূমিকা থাকে। এই নাটকে মোট ছাব্বিশটি গান রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি গান বাউলাঙ্গ সুরে রচিত। প্রথম দৃশ্যে রাজপুত্র সদাগরপুত্রকে নিয়ে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার সময় রাজপুত্রের কথার মধ্যে সদাগরপুত্র বুঝতে পারে যে রাজপুত্র কোনো 'সদাগরি মানিকের' খোঁজে যাচ্ছেনা। তারা 'নবীনা'র উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু রাজপুত্র তাকে 'নবীনা'র রূপ দিতে বারণ করে গেয়ে ওঠেন–

(গান)
"হে নবীনা, হে নবীনা।
প্রতিদিনের পথের ধূলায় যায় না চিনা।"

গানটিতে বাউলাঙ্গি সুরের প্রভাব আছে। 'নবীনা' বলতে এখানে মণিমাণিক্যের কথা বোঝায়নি। এই নবীনা হলো অসীম, যাকে চেনা যায় না। এর ভাষা বসন্তের আকাশে বাতাসে শোনা যায়। আবার ওই একই দৃশ্যে রাজপুত্রকে চেনা জগতের মাঝে হাঁপিয়ে উঠতে দেখে রাজমাতা তার বিতৃষ্ণার কারণ জানালে সে গায়–

(গান)
"আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।" (১ম দৃশ্য)

এই গানের মধ্যে বাউল তত্ত্বের মর্মকথা মিশে রয়েছে। রাজপুত্র জীবনে চাওয়ার আগেই সবকিছু পেয়ে গেছে। না পাওয়া যে কী, তা সে জানে না। তাই অজানাকে জানার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আবার সমুদ্রের মাঝখানে নৌকা ডুবে যাওয়ায় রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র এক নতুন দেশে এসে উপস্থিত হয়। এখানে তারা এক জীবনের সূত্র খুঁজে পায়। এই নতুন দেশে এসে তাদের জীবনের যে নব পর্ব শুরু হয়েছে তারই আভাস আছে রাজপুত্রের এই গানে–

(গান)
"এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী কূলে এলেম ভেসে।"

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপুত্রের গাওয়া এই গানে বাউলসুরের প্রভাব রয়েছে। তাসের দেশের মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে সংকীর্ণ নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ তারও ইঙ্গিত আছে এই গানের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাটকে গান একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেকথা ভাষায় প্রকাশ করা দুর্বোধ্য, সেকথা সংগীতের মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশ করা যায়। সংগীতের এই পন্থা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে স্বাচ্ছন্দে সাবলীল ভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর নাটকে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রয়োগ যেমন রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন বৈচিত্র্যধর্মী ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতও নাটকের অনেক বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। বাউলগান হলো সেই লোকঐতিহ্যবাহী গানগুলির মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আদ্যপ্রান্ত বাউল মননের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর নাটকগুলিতে অন্যান্য দেশজ সংগীতগুলির তুলনায় বাউলগানের প্রয়োগ সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। তিনি যে শুধু রূপক-সাংকেতিক নাটকে বাউলগান ব্যবহার করেছেন তা একেবারেই

নয়, তাঁর অন্যান্য শ্রেণীর নাটকেও বাউল সুরে রচিত গানের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। তবে এখানে আলোচিত প্রতিটি নাটকের গানে ব্যবহৃত বাউলগানের সুর নাটকের ভাববস্তু প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, শ্রী সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৯২
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীত', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৬, পৃ. ৯২৬
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীতচিন্তা', 'সংগীতের মুক্তি', বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, পৃ. ৪৯
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (একাদশ খণ্ড) বিশ্বভারতী, ১৪০৪, পৃ. ২২৪
৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাচ গান নাটক', 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', দেজ, ১৯৮৫, পৃ. ২৩
৬. রায়, আলপনা, 'গানের নাটক নাটকে গান', দে'জ, ২০১৭, পৃ. ৫৫
৭. ঘোষ, শান্তিদেব, 'দেশী সংগীতের প্রভাব', 'রবীন্দ্রসংগীত', বিশ্বভারতী, ১৩৭৬, পৃ. ১০৭
৮. ঘোষ, শান্তিদেব, 'রবীন্দ্র সংগীত', বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪০৪, পৃ. ১০১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চৌধুরী, শীতল, 'লোকসঙ্গীত চর্চা', রূপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮
২. পাল, অমর ও চৌধুরী দুলাল সম্পাদিত, 'বাঙলার লোকসঙ্গীত', পাঁচালি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৪৮
৩. রায়, আলপনা, 'গানের নাটক নাটকে গান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭
৪. চন্দ্র, সুধীর, 'রবীন্দ্রসংগীত : রাগ-সুর নির্দেশিকা', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৩